27 DEC 1991
তারিখ ২৭ DEC 1991
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬
দৈনিক বাংলা

বেসরকারী শিক্ষকরা আর কত বঞ্চিত হবে ?

এম আলী জিন্নাহ

দেশের অধিকাংশ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এখনও বেসরকারী। ৮৯% ছাত্র-ছাত্রী বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ছে। 'সমগ্র বাংলাদেশে বর্তমানে ৮৫২টি কলেজের মধ্যে ৬২৯টি বেসরকারী, বাকী ২২৩টি সরকারী। মোট ১১,৮৬৯টি স্কুলের মধ্যে ১১,৬৪২টি বেসরকারী, বাকী ২২৭টি সরকারী। ৫৬৫৪টি মাদ্রাসার মধ্যে ৫৬৫১টি বেসরকারী, বাকী মাত্র ৩টি সরকারীভাবে পরিচালিত হচ্ছে। মোট ৪৬ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৪৪ লাখ ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে বেসরকারী স্কুলে। ২ লাখ ৫ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত আছেন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। মাত্র ১৮ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত আছেন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে।' (সূত্র দৈনিক খবর, ২৯শে অক্টোবর '৯১)।

১৯৮৯ সালে সমযোগ্যতা, সমঅভিজ্ঞতা ও সমদায়িত্বে নিয়োজিত সরকারী ও বেসরকারী বেতন স্কেল অভিন্ন হবে বলে একটি নীতিমালা গৃহীত হয়। ১৯৮০ সালের ১লা জানুয়ারী ৫০ ভাগ বেসরকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ নীতিমালা কার্যকর হয়। বিগত দু'দশকে বিভিন্ন সময়ে বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন বাবদ সরকারী মঞ্জুরীর বেশ কিছু অংশ সরকারীভাবে বহন করা হলেও একজন বেসরকারী বা আধাসরকারী শিক্ষক সারাজীবন শিক্ষকতার মত একটি মহান পেশায় নিয়োজিত থেকে অবসর গ্রহণ করলে বা কোনভাবে চাকরিচ্যুত হলে অথবা দুর্ঘটনায় পতিত হলে বা মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য জাতীয় ভিত্তিতে অদ্যাবধি কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। যার দরুন ১০, ২০, ৩০ অথবা তারও বেশী সময় শিক্ষকতা করে একজন শিক্ষক কিংবা প্রতিষ্ঠানের প্রধান অবসর গ্রহণ করলে কিছু ফুলের মালা, একটি ছাতা, একটি তসবিহ বা এ জাতীয় কিছু উপহার সামগ্রী হাতে নিয়ে অনিশ্চয়তার মুখে বিদায় নিতে হয় একজন শিক্ষককে। ১৯৭৮ সালের অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি ও ১৯৮৬ সালের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টেও অবসরকালে একজন বেসরকারী শিক্ষককে যাতে পথে না বসতে হয় তার জন্য জাতীয় ভিত্তিক ১টি শিক্ষক কল্যাণ তহবিল গঠনের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও তা কার্যকরী করার কোন সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ অদ্যাবধি গৃহীত হয়নি। অবশ্য ১৯৮৯ সালের ৫ই এপ্রিল থেকে শিক্ষক কল্যাণ তহবিল চালু করা হলেও মাত্র সামান্য পরিমাণ টাকা এ যাবৎ উক্ত তহবিলে জমা হয়। অজ্ঞাত কারণে অস্থায়ী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টার নির্দেশে কোন প্রকার কারণ ও যুক্তি ছাড়াই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক আদেশ বলে ট্রাস্টের সকল কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করেন। উক্ত ট্রাস্ট এ যাবৎ চালু থাকলে মূলধন ১০০ কোটি টাকারও বেশী দাঁড়াতো।

উন্নত বিশ্বের অনেক দেশেই শিক্ষকদের জন্য অবসরকালীন এককালীন আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের দেশে দুঃখজনক হলেও সত্য, সে রকম ব্যবস্থা এখনও চালু হয়নি। অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু আমাদের এদেশের একজন বেসরকারী শিক্ষক সারাজীবন কাটিয়ে দেন জ্ঞানদানের মহৎ পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করে। অধিকাংশ শিক্ষক শুধুমাত্র উক্ত পেশার উপর নির্ভর করে জীবন অতিবাহিত করেন। অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের অগ্নিমূল্যের কারণে সীমিত আয় দিয়ে তারা চলতে পারেন না। তাও গ্রামের অনেক স্কুল-কলেজে শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন মিলে না। প্রাইভেট পড়ান এমন শিক্ষকের সংখ্যাও শতকরা ১৫ জনের বেশী হবে না। কিন্তু বাকী ৮৫% শিক্ষক-শিক্ষিকা চলেন অত্যন্ত টানাটানির মধ্যে। এভাবে কষ্ট করে নিজেকে মনেপ্রাণে তারা নিয়োজিত রাখছেন শিক্ষাদানের মহৎ পেশায়। চাকরি শেষে তাদেরকে প্রায় খালি হাতেই বিদায় নিতে হয় প্রতিষ্ঠান থেকে। যার ফলে শুধু নিজের নয়, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের সন্তানদের জীবনও হয়ে পড়ে অনিশ্চিত।

আমাদের দেশের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রী ও সন্তানেরা স্বামী ও পিতামাতার আয়ের উপরই ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর মতো আমাদের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা স্বনির্ভর নয়। সব ব্যাপারেই তাদেরকে নির্ভর করতে হয় অভিভাবকের আয়ের উপর।

অন্ততঃ তাদের পড়াশুনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা একটি চাকরি কিংবা কর্মসংস্থানের যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত এ নির্ভরতা বিদ্যমান থাকে। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই পিতাকে চিন্তিত হতে হয় ছেলে- মেয়ের ভরণ পোষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার জন্য। আর যে পিতা যদি বেসরকারী স্কুল, মাদ্রাসা কিংবা কলেজের শিক্ষক হন তাহলে তার অবসর সময়ে খালি হাতে ফিরার ব্যাপারটা কত বড় দুঃখ ও অশান্তির কারণ তা ভুক্তভোগীরাই একমাত্র অনুমান করতে পারেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন ম্যাট্রিক পাস অথবা আই, এ পাস শিক্ষক যদি চাকরি শেষে ২ থেকে আড়াই লাখ টাকা এককালীন পেয়ে খুশী মনে বাড়ী ফিরেন এবং চাকরি শেষে পেনশনসহ সরকারী সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে একজন গ্র্যাজুয়েট অথবা মাষ্টার্স (ট্রেনিংসহ) ডিগ্রীর শিক্ষক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সারা জীবন কলুর বলদের মতো শ্রম দিয়ে যদি খালি হাতে তাহলে ব্যাপারটা কি খুবই বৈষম্যমূলক এবং অবিচারমূলক হয় না।

আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সরকারী শিক্ষকদের উপর অন্য কোন দৃষ্টি নিয়ে এ কথা বলছি না। কারণ, সরকারী হওয়াকে স্বাভাবিক কারণে তারা এ সুযোগ পাচ্ছেন বা পাবেন। তাদের চেয়ে বেশী বিদ্যা অর্জনকারী মাধ্যমিক স্কুল অথবা বেসরকারী কলেজের একজন শিক্ষক এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত বলেই এ প্রশ্নের অবতারণা হচ্ছে। বেসরকারী শিক্ষকদের শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রমের পরিচালনা এবং তাদের চাকরি শেষে পেনশন এবং নিশ্চয়তা সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা নিজেরাই মনে হয় তেমন উৎসাহী অথবা উদ্যোগী নন। কেননা ইতিপূর্বে তাদেরকে এ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে কোন দাবী-দাওয়া বা আন্দোলন করতে দেখা যায়নি। মনে হয় তারা ঝিমিয়ে আছেন তাদের প্রাপ্য অথবা কাঙ্খিত দাবী সম্পর্কে।"

তাদের অনুৎসাহিত হবার কারণও অবশ্য আছে। তাদের কোন শক্তিশালী সংগঠন দাবী আদায়ের জন্য এখনও গড়ে উঠেনি। সংগঠন যেটা আছে তা নামমাত্র। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বাণ সৃষ্টিকারী দল বা গোষ্ঠী ব্যতীত সরকার থেকে দাবী দাওয়া আদায় অনেকটা স্বপ্ন দেখার মতোই। তাই এক্ষেত্রে আমি মনে করি বেসরকারী শিক্ষকদের সাংগঠনিকভাবে অগ্রসর হতে হবে এবং তাদের নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে নিজেদেরই এগিয়ে আসতে হবে। 'যার মাথা তার ব্যথা' বলে একটি কথা আছে। সেজন্যই বেসরকারী শিক্ষকদের সমস্যা, তাদের ভাবনা চিন্তা সম্পর্কে নিজেদেরকেই উদ্যোগী হতে হবে এবং কার্যকরী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অবশ্য সরকারকেও এক্ষেত্রে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার কারণ শিক্ষা যদি জাতির মেরুদন্ড হয় তাহলেও সে মেরুদন্ডের বলিষ্ঠতা অর্জিত হবে শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রতিবন্ধক দূর করার মধ্য দিয়েই। আধা সরকারী এবং বেসরকারী স্কুল ও কলেজগুলোতে সরকারী কলেজ ও স্কুলগুলোর তুলনায় অনুন্নত এবং জরাজীর্ণ।

আমাদের দেশে ক্ষমতা গ্রহণকারী সরকারগুলো সব সময়ই শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি করবেন বলে বড় গলায় জনগণ ও শিক্ষকদেরকে আশ্বস্ত করলেও বাস্তবে এ ক্ষেত্রে সরকারের অবজ্ঞারই পরিচয় পাওয়া যায় যা অত্যন্ত দুঃখজনক। শিক্ষা যেহেতু একটি পবিত্র এবং সার্বজনীন ব্যাপার সেহেতু সরকারী এবং বেসরকারী শিক্ষা ক্ষেত্রের এসব তারতম্য এবং বৈষম্য দূর করা খুবই প্রয়োজন। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছাত্র-ছাত্রীরা বেশী জ্ঞানার্জনের সুযোগ পায়, বিশেষ করে শিক্ষকদের কাছ থেকে। তাই বলে আমি ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠা বিভিন্ন নগরী উপ-নগরীর কিন্ডার গার্টেন অথবা কোচিং সেন্টারগুলোর কথা বলছি না। কিন্ডার গার্টেন এবং বেসরকারী কোচিং সেন্টারে পড়াশুনা যেমন ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার, তেমনি শিক্ষা ক্ষেত্রের শিক্ষকদের সুযোগ সুবিধাগত বৈষম্যরও এটি এক বিশেষ দিক। ছাত্র-ছাত্রী যেমন সকলের ক্ষেত্রে প্রাইভেট স্কুল ও কোচিং সেন্টারে যাওয়া সম্ভব নয়, তেমনি সকল শিক্ষকের পক্ষেও সেখানে কাজ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থার বাণিজ্যিক মনোভাব কাজ করে। এটা আমাদের জাতীয় স্বার্থে মোটেই উপযোগীনয়।

দেশের বিভিন্ন স্থানের পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ছে বাণিজ্যিক লাইনের শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে। সরকারীভাবেও তাদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে বুঝা যাচ্ছে। যাক, শেষ কথা হলো 'শিক্ষা' কোন পণ্য নয়, এটি একটি পবিত্র এবং আদর্শমন্ডিত ব্যাপার। সুতরাং শিক্ষাকে নিজের পথেই চলতে দিতে হবে এবং এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা অসুবিধা সরকারকে দেখতে হবে সর্বাগ্রে। শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি না হলে দেশ আরো অনুন্নত পর্যায়ে চলে যেতে পারে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কোন দেশকে ধ্বংস করতে হলে যেমনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করলেই যথেষ্ট একথা যেমন সত্য তেমনি এও সত্য যে, কোন দেশকে উন্নতির সোপানে উঠতে হলে সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করতেহবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকারা যেহেতু শিক্ষাক্ষেত্রের মহান ব্রতকে বাস্তবায়িত করার কাজে নিয়োজিত, সেহেতু তাদের ভবিষ্যৎ তো অনিশ্চিত হতে পারে না। বেসরকারী শিক্ষক-শিক্ষিকারা যে অধ্যবসায়, আন্তরিকতা ও ধৈর্যের সাথে তাদের পবিত্র দায়িত্ব পালনে সারাজীবন অতিবাহিত করেন তার মূল্যায়নে আমাদের কার্পণ্য করা ঠিক নয়।

যাক, বেসরকারী অথবা আধা-সরকারী স্কুল কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে তাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ-এর অবসান করতে তাদেরকে সাংগঠনিকভাবে সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে এবং সরকার ও রাষ্ট্রকেও তাদের ন্যায্য দাবী দাওয়া বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে হবে। চাকরি শেষে পেনশন, দুর্ঘটনা কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাদেরকে উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য ও আনুষাঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে রাষ্ট্র থেকে এবং তাদের শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম পুনরায় চালু করতে হবে।